(১)

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

আসন্ন পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টীয় অপশাসন ও নৈরাজ্যের অন্ধকার দিনগুলির অবসান ঘটাতে ও পশ্চিমবঙ্গবাসীকে একটি সুন্দর, সুশাসিত ও আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ ভবিষ্যত উপহার দেওয়ার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এবং হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনীতি ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তার আদর্শগত সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ৩৪ বছরের স্বৈরাচারী বাম রাজত্বে এই রাজ্যে যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর ক্ষোভ এবং পরিবর্তনকামী মানসিকতার অংশীদার জাতীয় কংগ্রেস পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য আগামী দিনে আমরা রাজ্যবাসীকে পাশে পেতে চাই। দল ভাগ হওয়া সত্ত্বেও নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে তার শক্তিকে সুসংহত করেছে এবং রাজ্যবাসীর আশা-আকাঙ্খাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই.(এম) দলের লাগামছাড়া হিংস্রতা এবং পাশাপাশি মাওবাদী-দের হত্যার রাজনীতি রাজ্যের সামাজিক পরিস্থিতিকে গৃহযুদ্ধের মত অস্থির করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ ও মাওবাদ—দুটিই সমান ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক। দেশের সংবিধান ও সমগ্র জাতির প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের গভীর দায়বদ্ধতা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 'দখল' ও 'পুনদর্খল'-এর বর্তমান রাজনীতি মানুষের মনে ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস তার নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে অবিরাম প্রচার চালিয়ে বি.জে.পি.-র মত সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িক দল ও ধর্মান্ধ শক্তিকে প্রতিহত করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশকে কলুষিত হতে দেয়নি।

এই অস্থির বাতাবরণের মধ্যে দাড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেস আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সামনে তুলে ধরতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ণ ও বিকাশের পথে এই কর্মসূচীগুলি রূপায়ণে কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে প্রত্যয়ী এবং অঙ্গীকারবদ্ধ।

(২)

জাতীয় প্রেক্ষাপট

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও 'বিবিধের মাঝে' একটি অখন্ড ঐক্যের শতাব্দী প্রাচীন মঞ্চ হিসাবে দীর্ঘদিন দেশ সেবায় নিয়োজিত। জাতীয় কংগ্রেস সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রচনার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সুরটিকে বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন, "কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর, তাঁদেরই সকলের যাঁরা এখানে বাস করেন, তা তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ অথবা পার্সী যিনিই হোন না কেন।'

পন্ডিত নেহরুর হাত ধরে আধুনিক ভারতের বিশ্বজনীন রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দৃপ্ত নেতৃত্বে তা পূর্ণতা পেয়েছিল এই উপমহাদেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। শ্রীমতি গান্ধীর 'গরীবী হটাও'-কর্মসূচী যেমন সমস্ত অনগ্রসর দরিদ্রতম মানুষদের বাঁচার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে তেমনি সামাজিক ন্যায় শিল্প, প্রযুক্তি, কৃষি ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক 'বিশ-দফা কর্মসূচী' 'উন্নত ভারতকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। শ্রী রাজীব গান্ধীর "মানুষের হাতে ক্ষমতা দাও"–এই উদাত্ত আহ্বান আসমুদ্রহিমাচল ব্যপী যে জনজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেই সামাজিক বিপ্লবকে ভারতের দরিদ্রতম ও প্রান্তিক মানুষদের চাহিদা পূরণে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে নিবেদিত রাজনৈতিক দল।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে কংগ্রেসকে তাদের উন্নয়ণধর্মী নীতি প্রণয়ন এবং সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থার নিরিখে নির্বাচিত করে। এই জনাদেশ ছিল ভারতের 'আম-আদমি'-র পক্ষে তাঁদেরই আশা পূরণের জন্য।

রাজীব গান্ধীর 'পঞ্চায়েতিরাজ' স্বপ্নকে সার্থক করতে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ.পি.এ. সরকার এক বিপুল সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে জনপ্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। এর মধ্যে ১২ লক্ষ মহিলা

আছেন। পঞ্চায়েতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার পর কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. সরকার মহিলা সংরক্ষণ বিলটি রাজ্যসভায় অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন। লোকসভায় বিলটির অনুমোদন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কেন্দ্রের প্রথম ইউ.পি.এ. সরকারের আমলে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। অর্থনীতিবিদ্‌দের আশা আগামী দিনে জি.ডি.পি. বৃদ্ধির হার ৯ এবং ১০ শতাংশের মধ্যে থাকবে। তুলনা করলে দেখা যাবে ১৯৯৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত এন.ডি.এ. সরকারের আমলে যে বৃদ্ধি ৫.৮ শতাংশ ছিল সেটাই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ. সরকারের প্রথম ৫ বছরে ৮.৫ শতাংশ হয়েছিল।

কেন্দ্রের 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিযুক্তি নিশ্চিতকরণ আইন'-এর মাধ্যমে কাজের অধিকারকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালে জাতীয় গড় হিসাবে কাজের দিন ছিল ৪২, ২০০৮-০৯ সালে সেটি হয় ৪৮ দিন এবং ২০০৯-১০- এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ দিন হয়েছে। ২০০৯ সালে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মত "ন্যাশানাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট" প্রণয়ন করতে ইউ.পি.এ. সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস খাদ্য সামগ্রী আইনকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও সরবরাহকে আরও গতিশীল হবে।

ইউ.পি.এ. সরকারের ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী 'শিক্ষার অধিকার'কে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে। বর্তমানে স্কুলছুট পড়ুয়াদের সংখ্যা ৮১ লাখে নেমে এসেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে "ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর হায়ার এডুকেশন" এবং "ইনোভেশন ইউনিভার্সিটি" স্থাপনের জন্য ইউ.পি.এ. সরকার সংসদে বিল আনার প্রস্তাব করছে। 'সর্বশিক্ষার অভিযান'-এ আরও বেশী অর্থ মঞ্জুর হয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় ও কস্তুরবা গান্ধী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

২০০৮ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতই সেই স্বল্পতম দেশগুলির মধ্যে একটি যেখানে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা তার পূর্ণ ছোবল মারতে পারেনি। ইউ.পি.এ. সরকার এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে আর্থিক বৃদ্ধির হার থমকে

দাঁড়ায়নি। কর লাঘব করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসাহী প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে চাহিদা বেড়েছে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে এবং সরকারি সম্পদ ও সুযোগ বেড়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ.পি.এ. সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার অধিকারের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত পঞ্চদশ শীর্ষক পরিকল্পনাটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণের জন্যই রচিত। সাচার কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলিতে বহুমুখী উন্নয়ণের কর্মসূচী এবং সংখ্যালঘু ছাত্রদের বৃত্তিদান প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

"রাজীব গান্ধী আবাস যোজনায়" বস্তিবাসীদের সম্পত্তি অধিকার আইনে সুরক্ষিত করার জন্য সরকার কাজ শেষ করে এনেছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ তা, যেখানে বলা হয়েছিল ভারত একটি "Slum Free" দেশ হবে। পাশাপাশি "ন্যাশানাল রুরাল হেল্‌থ মিশন"-এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউ.পি.এ. সরকার নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য ICDS কর্মসূচীতে উন্নতি সাধন করেছে। 'জওহরলাল নেহরু নগরোন্নয়ণ প্রকল্প' এবং 'রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প' রূপায়ণ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ.পি.এ. সরকারের একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

কেন্দ্রীয় সরকার 'বনাঞ্চলের অধিকার ও স্বীকৃতি' সংক্রান্ত একটি বিশেষ আইন চালু করেছে, তাতে বিশেষভাবে আদিবাসী ও বহুদিন ধরে যারা অরণ্যবাসী তাঁরা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছেন। জাতীয় কংগ্রেস তাঁর প্রতিশ্রুতি মত 'তথ্য জানার অধিকার আইন' প্রণয়ন করেছে যা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃত। এর সাথে সাথে ইউ. পি. এ. সরকার প্রতিটি নাগরিকের ইউনিক আইডেন্টি কার্ড' (U.I.D.) বা অভিন্ন পরিচয় পত্র চালু করে নাগরিক পরিষেবাকে উন্নত করবার প্রচেষ্টা করছে।

বর্তমানে মাওবাদী সমস্যা দেশের কাছে বিরাট বিপদের সংকেত। অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে উগ্র বামপন্থার সন্ত্রাস থেকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ.পি.এ. সরকার 'ব্যাকওয়ার্ড রিজিওনস্ গ্র্যান্ট ফান্ড' চালু করেছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষদের জন্য চালু হয়েছে 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমাযোজনা'। আবার ইউ.পি.এ. সরকার ২০১০-১১ আর্থিক বাজেটে 'স্বাবলম্বন প্রকল্প' চালু করেছে যা অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৪০ লক্ষ মানুষকে উপকৃত করবে এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা মাসিক পেনশন পেতে পারবেন।

২০১০-২০১১ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জী নতুন ভারত নির্মাণের সুদূরপ্রসারী দিশার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। গত বছরের তুলনায় ৮.৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ১১,০৮, ৭৪৯ কোটি টাকা। কৃষি ঋণের পরিমাণ ৩,২৫,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,৭৫,০০০ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আবার মোট পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দের ৪৬ শতাংশ অর্থ পরিকাঠামো উন্নয়নের খাতে রাখা হয়েছে যার পরিমাণ ১,৭৩,৫৫২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ও অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জী-র সুদরপ্রসারী চিন্তাধারা এই বছরের বাজেটের প্রতিটি পরিকল্পনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুমোদনগুলি হল—

- 'পাওয়ার সেক্টরে' বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫,১৩০ কোটি টাকা।
- গ্রামোন্নয়ণ প্রকল্পগুলিতে অর্থ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৬,১০০ কোটি টাকা এবং N.R.E.G.A. প্রকল্পে বৃদ্ধি হয়ে পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,১০০ কোটি টাকা।
- ভারত নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্ধ অর্থ ৪৮,০০০ কোটি টাকা।
- পিছিয়ে পড়া অনুন্নত অঞ্চলে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭,৩০০ কোটি টাকা
- রাজীব আবাস যোজনায় বস্তিবাসীদের এবং শহরাঞ্চলে গরীবদের জন্য খরচ করা হবে ১,২৭০ কোটি টাকা।
- অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তহবিল'-এ প্রাথমিকভাবে রাখা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা।
- 'সামাজিক ন্যায় বিচার ও অধিকার' মন্ত্রকের বরাদ্দ খাতে অর্থ পরিমাণ ৮০ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৫০০ কোটি টাকা।

- সংখ্যালঘু মন্ত্রকের জন্য ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এই বাজেটে অর্থ রাখা হয়েছে ২,৬০০ কোটি টাকা।
- বেশ কয়েকরকমের কর মকুব করা হয়েছে।

গত লোকসভা নিবার্চনে জাতীয় কংগ্রেস নির্দিষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি রেখেছিল, "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশের সার্বিক উন্নতিকে ধারাবাহিকভাবে নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাখবে।" একটি সর্ব অর্থে সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ থাকবে এই চিন্তাভাবনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় কংগ্রেস ২০১১—২০২০ দশকটিকে 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচারের দশক' হিসাবে চিহ্নিত করে নতুন ভারত নিমার্ণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

ডঃ মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকার দূনীর্তির বিরুদ্ধে এক আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের নাগরিকবৃন্দ আজ তথ্যের অধিকার সমৃদ্ধ যা প্রশাসনিক ও সরকারী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও পারদর্শিতা নিয়ে আসবার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে বিশ্ববন্দিত। টু জি স্পেকট্রাম বিলি বন্টন, কমনওয়েলথ গেমস্ পরিচালনা ও অন্যান্য যে সমস্ত দূনীর্তির অভিযোগ আজ জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে তার প্রত্যেকটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট, আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ফৌজদারী মামলা অতি দ্রুততা ও সক্রিয়তার সঙ্গে গ্রহণ করবার মধ্য দিয়ে ইউ.পি.এ. সরকার আজ দূনীর্তির বিরুদ্ধে তার 'জিরো টলারেন্স' ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। দূনীর্তির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কদর্য প্রচার, সরকারকে অস্থির করে তোলার অভিসন্ধি ও সংসদের কাজকর্মকে বন্ধ করার জঘন্য প্রয়াস চালিয়েছে। তবে দূনীর্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ও আপোষহীন মনোভাবের কাছে তারা পরাস্ত হয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের সবার কাছে এক বিশাল বড় সমস্যা। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই এই বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ও অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জী মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ও সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর তার নেতিবাচক প্রভাব লাঘব করতে প্রযত্নশীল। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা সজাগ ও নানাবিধ নীতি পরিবর্তন ও সংস্কার করেছে এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে, রাজ্যসরকার এই বিষয়ে নীরব ও কোনো সদর্থক ও কার্যকরী ব্যবস্থা করেনি।

(৩)

পশ্চিম বাংলার অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

গত ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের চরম অপদার্থতা ও অপশাসন এই রাজ্যকে এক হতাশাজনক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রকের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও অক্ষমতার কারণে পশ্চিমবঙ্গ গভীর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। ধারণা করা হচ্ছে এই সরকারের মোট দেনার পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী ঋণ গ্রহণকারী পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে একটি। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার ভাঙা রেকর্ড বাজালেও রাজ্যের এই দেউলিয়া অবস্থা মূলত রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের ব্যর্থতা। এই কারণে রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নতি কম হয়েছে, শিল্পায়ণ থমকে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে বিরাট প্রশাসনিক ব্যর্থতা যার মধ্যে ব্যাপক আকারে রয়েছে সর্বব্যাপী দুর্নীতি। ১৭টি সাধারণ পর্যায়ের রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়তে। ২০০৯-১০ সালে সবচেয়ে বেশী ঋণ গ্রহণকারী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মোট দেনার ৪০ শতাংশ স্বল্পসঞ্চয় ভান্ডার থেকে এসেছে। গত কয়েক বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয়, বেতন পেনশন এবং সুদ দিতে গিয়ে গভীর সংকটের মুখোমুখি। এই ধরণের খরচের প্রয়োজন মেটাতে সরকার নিজেকে আরও ঋণের দায়ে আবদ্ধ করেছে। পাশাপাশি রয়েছে রাজ্যের স্বল্প পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গের ‘Own Tax / NSDP’ অনুপাত অনেক কম, ৪.৭৮ শতাংশ। বিহার এবং ছত্তীশগড়-এর মত, দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দুই রাজ্য, এদের ‘Tax/NSDP’ অনুপাত যথাক্রমে ৪.৯৫ শতাংশ এবং ৭.৬৬ শতাংশ, যা পশ্চিমবঙ্গের চাইতে বেশী। স্বল্প মাত্রার ‘ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার’, দুর্বল পরিকাঠামো এবং যার ফলে কম বিনিয়োগ এবং শিল্পায়ণের নিম্নগতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ কমে গেছে।

তালিকা — ১

সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রহণকারী রাজ্যগুলির ২০০৯-১০ সালের নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ

রাজ্য	নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)	নিজস্ব কর বিহীন রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)	সুদ সংগ্রহ (কোটি টাকায়)	মোট রাজস্বের ওপর নিজস্ব রাজস্বের অংশ (শতাংশ)
উত্তরপ্রদেশ	৩৩৪৫৬	৫৬২৭	১০৮০	৪২.৫২
মহারাষ্ট্র	৫০৯৮৬	১৩৮৯৪	১১১৪	৭৪.১০
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৪৭৬	২৭২৯	১২৯২	৫৫.৫৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪০৬৬৪	১২৯৪৬	৪৪৫৬	৭৩.৫৩
গুজরাট	২৫৪৫০	৪৮৭১	৫৫০	৭৩.৮৩

পশ্চিমবঙ্গের Tax/NSDP অনুপাত কম হওয়ার পিছনে আছে খানিকটা বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকারখানার প্রভাব, সার্বিক দুর্নীতি, কম বিনিয়োগ তথা প্রশাসনিক স্তরে দুর্বল কর্মসংস্কৃতি।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বেশী নয় সেই কারণে ২০০৯-২০১০ সালে মোট ব্যয়ের ৮৫ শতাংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল রাজস্ব ব্যয়ের জন্য (Revenue Expenditure) যার অধিকাংশ প্রয়োজন হয়েছিল বেতন, পেনশন এবং সুদ প্রদানের মত ‘কমিটেড এক্সপেনডিচার’-এর প্রয়োজন মেটাতে। মাত্র ১৫ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছিল ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার-এর ক্ষেত্রে। সবচেয়ে বেশী ঋণ গ্রহণকারী পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে শতাংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গই ‘ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার’-এর বিচারে সবচেয়ে নিম্নে রয়েছে।

তালিকা — ২

সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রহণকারী রাজ্যগুলির 'ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার' -এর খতিয়ান ২০০৯-১০ (কোটিতে)

রাজ্য	মোট ব্যয়	রাজস্ব্য ব্যয়	মূলধনী ব্যয় (ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার)
উত্তরপ্রদেশ	১২১৫৯৭	৯২৮৬৭ (৭৬%)	২৮৭৩০ (২৮%)
মহারাষ্ট্র	১১৯৭৬২	৯৬১৮৪ (৮০%)	২০৫৭৮ (২০%)
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৩০৯৯০	৭৬৫৫৭ (৭৬%)	২৪৪৩৩ (২৪%)
গুজরাট	৫৭৪১৭	৪৫৭২৮ (৮০%)	১১৬৮৮ (২০%)
পশ্চিমবঙ্গ	৭০৯২২	৬০২৫৩ (৮৫%)	১০৬৭০ (১৫%)

পশ্চিমবঙ্গকে প্রতি বছর বহুবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আপৎকালীন ঋণ নিতে হয়েছে এবং বহুবার ওভারড্রাফট নিতে হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে রাজ্যকে ১৪২ দিন, ২০০৮-০৯-এ ৩৯ দিন এবং ২০০৯-১০-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৫ দিন আপৎকালীন ঋণ নিতে হয়েছে। উক্ত তিন বছরে এই রাজ্য ওভার ড্রাফট নিয়েছে যথাক্রমে ৬ বারে ৬৫ দিন, ১ বারে ৪ দিন ও ২ বারে ৮ দিন। উক্ত তিন বছরে কেরালা ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যকে আপৎকালীন ঋণ নিতে হয়নি, ওভারড্রাফট তো দূরের কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য যেসময়ে আপৎকালীন ঋণ বা ওভারড্রাফট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করে তখন উন্নয়ন বাবদ সমস্ত খরচ বন্ধ রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৪২ দিন আপৎকালীন ঋণ গ্রহণ করে এবং ৬৫ দিন ওভারড্রাফট-এর বোঝা নেয় তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যায় এই রাজ্যে উন্নয়ণ কোন তলানিতে ঠেকেছে।

Low Capital Expenditure হেতু এই রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নতি কম হয়েছে, শিল্পায়ণ থমকে গেছে এবং রাজস্ব সংগ্রহও বাড়েনি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের দিকে অনুন্নয়নের একটা অন্ধকার বৃত্ত রচনা হয়েছে।

আবার রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় 'ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলন না হওয়ায় কেন্দ্রের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ছাড় মেলেনি। সি.এ.জি. রিপোর্ট বলছে 'ওই আইন প্রণয়ণ না করায় রাজ্য সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে ৪৯৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার সুদ-ছাড়ের সুবিধা নিতে পারেনি'। বস্তুত গত পাঁচ অর্থবর্ষের হিসাব ধরলে ক্ষতির অঙ্কটা দু-হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

এখানে অন্ধ্রপ্রদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে, কেননা দুই রাজ্যই ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যা এবং বিধানসভা ও লোকসভার আসনের দিক থেকে একই স্থানে অবস্থান করছে। তপশিলী ও আদিবাসী জনসংখ্যা নিরিখে দুইটি রাজ্য প্রায় কাছাকাছি। উন্নয়ন খাতে অন্ধ্রপ্রদেশ ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০-এ যথাক্রমে ব্যয় করেছে ৬৫,৪৪২ কোটি এবং ৭২,১৯৯ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে একই সময়ে সেই ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬,৯৭৫ কোটি এবং ৩৬,৬২৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনাখাতে অন্ধ্রপ্রদেশ ২০০৮-২০০৯ সালে ব্যয় করেছে ৪১,৫৩৯ কোটি এবং ২০০৯-২০১০-এ সেই পরিমাণ ৪০,১৭৪ কোটি টাকা। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যয় করেছে যথাক্রমে ১৪,২৬১ কোটি এবং ১৬৭২৫ কোটি টাকা। আবার পরিকল্পনা বর্হিভূতখাতে অন্ধ্রপ্রদেশ ব্যয় করেছে ২০০৯-২০১০-এ ৬০,৮১৭ কোটি টাকা সেখানে একই বছর পশ্চিমবঙ্গ করেছে ৫৪,১৯৭ কোটি টাকা। সামাজিক উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের নিরিখেও অন্ধ্রপ্রদেশ এগিয়ে আছে। ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০-এ অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬,৭৮৬ কোটি এবং ৩৫,৬৬৮ কোটি টাকা। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে সেই ব্যয় যথাক্রমে ২০,৯৬৮ এবং ২৮,৪৭২ কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব আয় ব্যয়ের হিসাব থেকে এটা পরিষ্কার যে এই রাজ্যে উন্নয়ণে যতটুকু কাজ হচ্ছে তার বেশিরভাগটাই চলছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অংশ অনুদান এবং বিভিন্ন জনমুখী কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ দিয়ে। এই টাকা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তার জন্য রাজ্য সরকারের কোন নজরদারি নেই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদগুলিতে বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা পড়ে থাকছে।

বন্ধ শিল্প ও কর্মসংস্থান

বামফ্রন্ট সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে নিজেদের জমি-মাফিয়া হিসাবে প্রতিপন্ন করে তুলেছে। তিন ফসলি ঊর্বর জমি নামমাত্র মূল্যে কেড়ে নিয়ে দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে এই সরকার। যা দেখে পুঁজিপতিদের স্নেহধন্য সি.পি.আই.(এম) নেতাদের ভন্ডামির চেহারাগুলি আরও বেআব্রু হয়ে পড়েছে। সিঙ্গুরের জমি কত দামে দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার নিশ্চুপ। কোন শ্বেতপত্র প্রকাশ করার সাহস সরকার দেখাতে পারেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও শিল্পপতিদের জমি দিতে গিয়ে সাধারণ জমিদাতাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাজারহাটেও হিডকোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জমি নেওয়া হয়েছে নামমাত্র মূল্যে। এখন সি.পি.আই.(এম)-র কাছে বিদেশী পুঁজি, টাটা-বিড়লারা স্বাগত, অচ্ছুৎ নয়। অথচ এদের বিরোধীতা করেই বামপন্থীরা কংগ্রেস সরকারের উন্নয়ণকে বার বার বাধাদান করেছে। এই সরকারের ভুল নীতি ও অদূরদর্শিতার কারণে হুগলী নদীর দুই পাশে কোলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত ছোট, বড়, মাঝারি শিল্পগুলি সব বন্ধ। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণী, দুর্গাপুর, হলদিয়াতে যে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন আজ তা ভগ্নপ্রায়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ঘনত্ব সব চাইতে বেশী। ৯০৪ জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে। আর মাথা পিছু জমির পরিমাণ এ রাজ্যে সবচাইতে কম। মাত্র ১০ কাঠা জমি প্রতি জন পিছু। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-জমি, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি এই জায়গায় অবস্থান করছে। কংগ্রেসের ঘোষিত অর্থনীতি বিশ্বায়ণের পথে ভারতবর্ষের ভূমিকাকে সদর্থক জায়গায় দাঁড় করিয়েই দেশের শিল্পনীতিতে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। কংগ্রেস তাই সবসময়ই শিল্পায়নের পক্ষে। বরঞ্চ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই বিদেশী বিনিয়োগ ও পুঁজির বিরুদ্ধে অহেতুক রাজনৈতিক স্লোগান তুলে অনেক বাধা দিয়ে এই রাজ্যের সর্বনাশ করেছে। তার সঙ্গে বামপন্থী জঙ্গী আন্দোলন এই রাজ্যকে শিল্প প্রতিষ্ঠার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। আমরা চাই কৃষকদের অত্যাচার করে নয়, তিন ফসলি জমির বাইরে অনেক পতিত জমি, অব্যবহৃত জমি, এক ফসলি জমি ইত্যাদির ওপর শিল্প গড়ে উঠুক। এই সরকার কোন 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' গড়ে তোলেনি! এক ফসলি জমি যদি নিতে হয় কৃষককে বিকল্প সমপরিমাণ জমি দিতে হবে।

হলদিয়া শিল্পাঞ্চল তৈরী করার সময় সরকারের দানবীয় কান্ড আমরা ভুলে যাইনি। ২ জন যুবক গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। কেউই জমি ও ঘর পায়নি। চাকরী তো দূর অস্ত। তাই সরকারী আশ্বাস কৃষক ও গ্রামবাসীদের কাছে দুশ্চিন্তা ও দীর্ঘশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গে ৭০ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-এ নাম লিখিয়ে বসে আছে, যা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচাইতে বেশী। এই রাজ্যে প্রায় ৬৫ হাজার কলকারখানা ২৮ বৎসরে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৭ লক্ষ কর্মরত শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। ২৭৫ জন শ্রমিক আত্মহত্যা করেছে। এই রাজ্যেই বন্ধ হওয়া কলকারখানাগুলির প্রায় ৪০ হাজার একর জমি পড়ে আছে। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব, কিন্তু নীতিহীন অদক্ষ বামফ্রন্টীয় অপশাসন সমস্যা বাড়িয়ে তুলতেই পারদর্শী।

সি.পি.আই.(এম)-এর লেজুড় শ্রমিক সংগঠনের ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পকারখানার পাট ওঠাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। গত ২০০৯ সালে দেশ জুড়ে বনধ্ এবং লক-আউট-এর সংখ্যা ছিল ৩৫১। তার মধ্যে ২৬৭টিই পশ্চিমবঙ্গে। এইরকম একটি ১২ ঘন্টার বন্ধের প্রকোপে রাজ্যকে শিল্প থেকে ৮০০ কোটি বেশি টাকা হারাতে হয়েছে। ২০০৯ সালে ধর্মঘটে মোট ১৩৫.৭ লক্ষ কর্ম দিবস নষ্ট হয়েছে এই রাজ্যে। তাই আই. টি. সি. ছাড়া প্রায় সব বড় সংস্থাই রাজ্য থেকে সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে।

গ্রামোন্নয়ণ ও দারিদ্র্যদূরীকরণ কর্মসূচীতে দুর্নীতি ও ব্যর্থতার অনন্য নজির

গ্রামোন্নয়ণের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের ব্যর্থতা অপরিসীম। কেন্দ্রীয় সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রদেয় অর্থ খরচ না করে নয়ছয় করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা আজ সুবিদিত। প্রয়াত

ইন্দিরা গান্ধীর প্রদর্শিত পথে কেন্দ্রীয় সরকারের গরীবি হঠাও, জনশক্তি, কিষাণ মিত্র, খাদ্য সুরক্ষা, অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনা, গ্রাম সড়ক, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদির সাফল্য নিয়ে 'জাতীয় স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশনের' রির্পোটে (২০১০) বলা হয়েছে গুজরাট, কর্ণাটক, ঝাড়খন্ডের মত রাজ্য যখন যথাক্রমে ১০০, ৮৩ এবং ৮২ শতাংশ সাফল্য দেখিয়েছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের হার ৫১ শতাংশ। রির্পোটে বলা হয়েছে দেশের মধ্যে অনাহারে থাকা পরিবারের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী পশ্চিমবঙ্গে।

১০০ দিনের কাজের কর্মসূচীতে ভুয়ো কাগজপত্র পেশ করে ক্যাডারদের টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। গরিবদের 'আন্ত্যোদয় যোজনার' টাকায় কেনা চাল-গম রেশন দোকান থেকে খোলা বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকাউন্ট জেনারেলের (এজি) রিপোর্টে বলা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় ১৮ লক্ষ কুইন্টাল চাল-গমের হদিস মেলেনি, বাজারে যার অর্থমূল্য ৯০ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের রাজত্বে ন্যূনতম মজুরী আইন সর্বত্র চালু হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত শস্য কিনে নেওয়ার মত পরিকাঠামো বামফ্রন্ট সরকার গড়ে তোলেনি। ফসলের দাম পাওয়ার কোনও সরকারী ব্যবস্থা না থাকার দরুণ কৃষককে ফসল ওঠার মরসুমে জলের দরে কৃষিপণ্য বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হতে হচ্ছে। আলুর বন্ড নিয়ে রাজনীতি, বন্যার প্রকোপ ও কমরেডদের জুলুমবাজীতে সাধারণ কৃষকদের অবস্থা আজকে অবর্ণনীয়। পশ্চিমবঙ্গে দিনমজুরের সংখ্যা ১ কোটির কাছাকাছি। নূন্যতম মজুরী থেকে বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কর্মসংস্থানের আশায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। রাজ্য ত্যাগের এই হার পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশী। প্রায় ১০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালে গ্রামীণ কৃষকের সংখ্যা (যাঁদের জমি আছে এবং চাষ করেন) ছিল ৫৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৯৩ জন। এই সংখ্যা ২০০১ সালে জনগণনায় কমে দাড়িয়েছে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯২২ জন। অর্থাৎ ১০ বছরে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮১ জন কৃষক পশ্চিমবাংলায় কমে গিয়েছে। এই প্রবণতা পরবর্তী বছরগুলিতে আরও বেড়েছে। ১৯৯১ সালে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪৭৮ জন, ১০ বছর ব্যবধানে ২০০১-এর জনগণনায় সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছিল ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৭৯ জন। অর্থাৎ

গ্রামীণ অর্থনীতিতে বামফ্রন্টের শাসনে উন্নতিতো আসেইনি বরং বর্তমানে অবস্থা চরম ভয়াবহ। এখন গ্রাম বাংলায় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের আনুপাতিক হার ৪০ শতাংশেরও বেশী।

কয়েকবছর আগে ভারত সরকার প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অর্জুন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটা সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে কৃষি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরীর জাতীয় হার ৭০ টাকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই মজুরির হার পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪৫ টাকা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৭ টাকা। এইসব ভুমিহীন প্রান্তিক চাষীদের জন্য বামপন্থী নেতাদের আজ মন কাঁদে না। 'লাঙল যার জমি তার' সি.পি.আই.(এম)-এর এই শ্লোগান আজ বদলে গিয়েছে। শিল্পায়ণের নামে গায়ের জোরে পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে। সবকিছু হচ্ছে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে।

ভূমি সংস্কারের মিথ্যাচার

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের ভাঁওতাবাজি এক কথায় মিথ্যাচারের বেসাতি। পরিসংখ্যানের আসল তথ্য লুকিয়ে রেখে তারা গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে জনদরদী তক্‌মাটা তুলে ধরতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির পরিমাণ ৩ কোটি ২০ লক্ষ একর। যার মধ্যে কৃষিজমির পরিমাণ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৫২১ একর। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস সরকারের সময় ভূমি-সংস্কার আইন তৈরী হয়। সেই সময় থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সরকারের আমলে কৃষি জমি খাস করা হয়েছে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার একর। তুলনায় ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বামফ্রন্টের ৩৩ বছরের জমানায় কৃষি জমি খাস হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৮১ একর। আবার ১৯৭২ থেকে '৭৭ যে সময়টাকে ধরে বামপন্থীরা চর্বিত চর্বণ করেন, প্রয়াত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সেই আমলে ৫ বছরে কৃষি জমি খাস হয়েছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর।

নীচের আরও কয়েকটি পরিসংখ্যান বামপন্থীদের তথ্যের জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের কারসাজিকে ফাঁস করে দেবে।

মোট খাস কৃষি জমি বিলি

মোট খাস কৃষি জমি বিলি (ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত)—১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৯.২০ একর)

মোট খাস কৃষি জমি বিলি (জানুয়ারী ১৯৭৭ পর্যন্ত)—৬ লক্ষ ৩৫ হাজার একর।

মোট খাস কৃষি জমি বিলি (১৯৭২-১৯৭৭)—২ লক্ষ ৬০ হাজার একর।

মোট খাস কৃষি জমি বিলি (১৯৭৭ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত)—৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৬৯.২০ একর।

ভূমিহীন কৃষকদের পাট্টা বিতরণ

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিতরণ (ফেব্রুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত)—৩০ লক্ষ ১০ হাজার ৫৭২ জন।

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিতরণ (১৯৭২ থেকে ১৯৭৭)—৯ লক্ষ ৯০ হাজার জন।

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পাট্টা বিতরণ (১৯৭৭ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১০)—২০ লক্ষ ২০ হাজার ৫৭২ জন।

(তথ্যসূত্র ঃ বিধান সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উল্লিখিত পরিসংখ্যান)

আবার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৭৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত গত ৩০ বছরে অতিরিক্ত ৬.১০ লক্ষ একর কৃষি জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে এবং প্রতি কৃষক পিছু গড়ে মাত্র ১০ কাঠা করে জমি বিলি করা হয়েছে। এই বিলি করা জমি অধিকাংশই দলীয় ক্যাডার ও সমর্থকদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে সরকারী চাকুরীজীবি থেকে শুরু করে গাড়ীর মালিক এমনকি কিছু জোতদারও থেকে গেছেন।

বামফ্রন্টের অপারেশন বর্গার নামে যে ১৩ লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত করা হয়েছিল তাঁরা কেউই জমি ধরে রাখতে পারেননি। অধিকাংশই পরবর্তীকালে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে পড়েছে। এর কারণ চাষবাসের উপযুক্ত অর্থের অভাব। গত ৩৪ বছরে সি.পি.আই.(এম) পরিচালিত সরকার এই সমস্ত

গরীবদের জন্য 'নন-ল্যান্ড ইনপুট' হিসাবে কৃষি ঋণ, ভাল বীজ, উন্নত প্রযুক্তি বা কমদামে সার ও কীটনাশক কোন কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলস্বরূপ গরীব কৃষকদের মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার করতে হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মোট কৃষি জমির মধ্যে মোট সেচ সেবিত কৃষিজমির আনুপাতিক হার এর পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাচ্ছে পাঞ্জাবে-এর পরিমাণ ৯৯.৯%, হরিয়ানাতে ৮৫%, তামিলনাড়ুতে ৫৫%, উত্তরপ্রেদেশে ৬৬.৫%। সর্বভারতীয় গড় ৪০.২%। আর পশ্চিমবঙ্গে ২৬.১%। বাংলার গ্রামের কৃষি জমির সেচের অবস্থান আজ ঠিক কোথায়? উত্তরবঙ্গের সব চাইতে বড় সেচ প্রকল্প-তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য তদানীন্তন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব মুখার্জী অতিরিক্ত ১৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরী দিয়েছিলেন পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়নের জন্য। টাকা লুঠ হয়ে গেল। কাজের কাজ কিছুই হল না। দক্ষিণবঙ্গের সুবর্ণরেখা প্রকল্প ১৯৯১ সাল থেকে এক পা এগোয়নি। আগের বিহার বর্তমানের ঝাড়খন্ড রাজ্যে তার পরিপূর্ণ রূপায়ণ হয়ে গেছে। কংসাবতী আধুনিকীকরণ প্রকল্প হল না। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাঘই নদী সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পটি ২৮ বছরের বামফ্রন্ট রাজত্বে রূপায়িত হল না। হল না দুবদা বেসিনের সংস্কার। ইছামতী নদীর সংস্কারের অভাবে ডুবছে উত্তর ২৪ পরগণা। একই অবস্থা অন্যান্য নদী প্রকল্পগুলির। অধিকাংশ রিভার লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্পগুলি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেচের ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। উল্টে প্রতি বছর বন্যা আর খরার জন্য কৃষকরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকট ও দৈন্যদশা

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বামফ্রন্ট সরকারের হাতে প্রথম থেকেই উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে ক্যাডার পোষণ, দুর্নীতি এবং কাজ করার অনীহা স্বাস্থ্য দপ্তরের গ্রহণযোগ্যতাকে নেতিবাচক করে তুলেছে। চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ এই বিভাগটির গত ৩৪ বছরে উন্নতি সামান্যই হয়েছে।

সরকারী হাসপাতালগুলির অবস্থা নরক কূণ্ডের মত। যার ফলে বেসরকারী নার্সিংহোমগুলির রমরমা অবস্থা। পাশাপাশি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ডাক্তার বিহীন ও অবহেলিত, এই কেন্দ্রগুলিতে জীবনদায়ী ঔষধ এবং সাপ ও কুকুরের কামড়ের প্রতিষেধক অমিল। সরকারী হাসপাতাল চত্বরে দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগীদের প্রাইভেট নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য, পয়সা দিয়ে ওষুধ রোগীকে কিনতে হয়। অথচ সদিচ্ছার অভাবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের দেওয়া কোটি কোটি টাকা অব্যবহৃত হয়ে ফেরত চলে গেছে। যোজনা কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে শুধু গ্রামীণ স্বাস্থ্য উন্নয়ণে খরচ না-হওয়া অর্থের পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকা। শুধু তা-ই নয়, জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এ যেখানে রাজ্যের মাধ্যমে অন্তত ১৬ শতাংশ খরচ হওয়ার কথা, সেখানে গত পাঁচ বছরে খরচের মাত্রা ৯ শতাংশের ওপরে ওঠেনি। আর একাদশ যোজনার প্রথম তিন বছরে (২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০) স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের ৩৯ শতাংশ মাত্র ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সঠিকভাবে খরচ করতে না পারলে আগামী মার্চের পরে যোজনার মেয়াদ শেষে নতুনভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা এ রাজ্যে আসবে না। যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মনমোহন সিং স্বয়ং বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকারের এই উদাসীনতায়। যোজনা কমিশনের স্টেট প্ল্যান ডিভিশনের রিপোর্টে এ ও দেখা যাচ্ছে ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়কালে গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের বিভিন্নখাতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ২১২৮ কোটি টাকা, তার মধ্যে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৪৬৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬৬১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা গরীব মানুষদের জন্য কাজেই লাগায়নি এই ‘জনদরদী’ সরকার। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ সমস্যাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এই অপদার্থ, দুনীর্তিপরায়ণ বামফ্রন্ট সরকার।

কুষ্ঠ নিবারণ কর্মসূচীতে কেন্দ্রের দেওয়া ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে চলতি আর্থিক বছরে খরচ হয়েছে মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা। ২০১১-র মার্চের মধ্যে ৬০ শতাংশ টাকাও ব্যয় হবে না কুষ্ঠ রোগীদের সেবা কাজে।

যোজনা কমিশনের স্টেট প্ল্যান ডিভিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে তলানিতে এসে ঠেকেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকের পাশাপাশি মোট চিকিৎসক পদের ১২ শতাংশ খালি। জাতীয় পরিবার কল্যাণ প্রকল্পেও কেন্দ্রীয় অনুদান খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অনুন্নত এলাকা তহবিলে (বি.আর.জি.এফ.) কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৬৫ শতাংশ অর্থ (গত তিন বছরে) খরচ করতে না পারায় দিল্লীতে ফেরত চলে গেছে।

সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ল্যাবরেটারি টেকনিশিয়ানের অভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হওয়ায় বেসরকারী ক্লিনিকগুলির রমরমা অবস্থা। গরীব মানুষদের পরিষেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করতে ব্যর্থ এই বামফ্রন্ট সরকার। চব্বিশ ঘন্টা পরিষেবা চালু হয়নি অধিকাংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছিল প্রতি ব্লকে অন্তত একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে দশ শয্যা হাসপাতালে পরিণত করার মাধ্যমে ৯২২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিটিতেই ‘মেটারনিটি’ ইউনিট গড়ে তোলা হবে। অথচ এই প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। অন্তঃসার শূন্য ঘোষণাই থেকে গেছে।

বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের আরও একটি ব্যর্থতা হল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি সেন্টার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত লাল ফিতের ফাঁসেই আটকে রাখা। যার পরিণতিতে গ্রাম বাংলার অধিকাংশ মানুষ ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যোজনা কমিশনের রিপোর্টে এই রাজ্যের মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং শিশুদের পুষ্টির অবস্থার ভয়াবহ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। ‘ডিজি কন্ট্রোল প্রোগাম’ এই রাজ্য থেকে অন্তর্হিত। এই রাজ্যের মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রথম সারিতে রয়েছে। আসলে ৩৪ বছরে বাম জমানায় ক্যাডাররাজ কায়েম করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শিকেয় তুলে দিয়েছে। এক শ্রেণীর পার্টি অনুগত ডাক্তার বদলির নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দিনের পর দিন চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে ব্যবসার স্তরে নামিয়ে এনেছেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা হাসপাতালের মত জরুরী পরিষেবাকে পার্টির কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করে ফেলেছেন। তাই সুচিকিৎসার অভাবে এ রাজ্যের মানুষেরা বাধ্য হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে প্রতি ১ কোটি মানুষ পিছু ২.২১টি খালি সরকারি হাসপাতাল এবং ১ লক্ষ মানুষ পিছু ৩.৭৯টি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা রয়েছে যা সর্বভারতীয় নিরিখে খুবই হতাশজনক।

আইন শৃঙ্খলার বেহাল অবস্থা ও লাল মাফিয়াদের রাজত্ব

বামফ্রন্টের সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের অপশাসনে ক্ষমতার শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, হরণ করা হয়েছে মানবাধিকার, লুণ্ঠিত হয়েছে নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম। পুলিশের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও অকমর্ণ্যতার ফলে প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরটির উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তোলা আদায় ও প্রোমটারী গুন্ডা চক্র এই রাজ্যে বর্তমানে কর্ম-সংস্থানের সবচেয়ে বড় সুযোগ। রাজ্য পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী ২০১১-র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার জামিন অযোগ্য পরোয়ানা কার্যকারী হয়নি। গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাসের পরিবেশ জিইয়ে রেখে বিরোধীদলগুলিকে দমন করতে খুনী আসামীদের প্রকাশ্যে ছেড়ে দিচ্ছে বামফ্রন্টের বড় শরিক সি.পি.আই.(এম)। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শাসনের ত্রাস মজিদ মাস্টার, যিনি পুলিশের খাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও সি.পি.আই.(এম)-এর বদান্যতায় আলিমুদ্দিনে গিয়ে পুলিশ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে প্রশাসন বাধ্য হয়ে নড়ে বসলেও সদিচ্ছার অভাব আজও পরিস্ফুট। অতীতের সাঁইবাড়ির হত্যাকান্ড থেকে সাম্প্রতিক সময়ে নেতাই, নন্দীগ্রাম, সূচপুরের ও ছোট আঙারিয়ার গণহত্যা সবই সংঘটিত হয়েছে সি.পি.আই.(এম)-এর গুন্ডাবাহিনী দ্বারা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হুগলী ও বর্ধমান জেলায় কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা সি.পি.আই.(এম)-র অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়ে বিরোধী সংহারে নেমেছে। কেশপুর, গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, নেতাই, ঘাটাল, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, রায়না ইত্যাদি স্থানে এই সমস্ত হার্মাদদের অস্ত্র শিবির রমরমিয়ে চলছে। বুদ্ধবাবুর 'বিরোধীদের মাথা গুঁড়িয়ে দেব'-এই শপথ এই সমস্ত শিবিরের অস্ত্রধারীদের মূল মন্ত্র। সাঁইবাড়ির হত্যাকান্ডের এক নায়কের 'ওদের ঘিরে লাইফ হেল করে দেব' এই উক্তির পর নন্দীগ্রামের হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। সি.পি.আই.(এম)-এর সমাজবিরোধীদের উৎসাহিত করেছিল তাদের এক কেন্দ্রীয় নেত্রীর 'দমদম দাওয়াই'-এর মত স্লোগান। এককথায় সমাজবিরোধী বাম নেতা-নেত্রীরা সমানে চেষ্টা করে চলেছে ভন্ডামি, জালিয়াতি, বিবেকহীনতা ও পাশবিকতাকে দৃঢ়ভাবে সমাজ

ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করার। আজকে সি.পি.এম.-এর 'কমিউনিষ্ঠ কালচার'-এর মধ্যে পড়ে খুন-জখম, নারী ধর্ষণ ও অপহরণ, কংগ্রেসীদের সন্ত্রস্ত করা, লুটপাট, ভাঙচুর, সামাজিক বয়কট, জোর করে টাকা আদায় ইত্যাদি।

কংগ্রেস নেতা তুহিন সামন্তের হত্যাকারী আলিমুদ্দিনের স্নেহধন্য পুলিশ অফিসার বর্ধমানের প্রাক্তন পুলিশ সুপারের সৌজন্যে বহাল তবিয়তে 'ভাল' জায়গায় পোস্টিং পেয়ে আছেন। সি.পি.আই.(এম)-র বদান্যতায় কিছু পুলিশ অফিসার রাজ্যটাকে সমাজবিরোধী ক্যাডারদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে দিয়েছেন। বারাসাতে সাম্প্রতিক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাজীব দাসের খুনের ঘটনা বুদ্ধবাবুর মরূদ্যানের অন্ধকার রাতটাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ২০০৮ সালের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ধর্ষণের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ২২৬৩টি নথিভূক্ত অভিযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ক্রাইম ব্যুরোর এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে স্বামীর হাতে স্ত্রীর নির্যাতনের ঘটনায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে পশ্চিমবঙ্গ। আবার পণের জন্য বধূহত্যার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবরাজ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে। আবার ৩৪ বছরের বামশাসনে গ্রামাঞ্চলে যে ভয়াবহ দারিদ্রতার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাবে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতায় নারী পাচার পশ্চিমবঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য ব্যবসার অংশ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে।

রাজনৈতিক হত্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সারা দেশের তুলনায় শীর্ষে অবস্থান করছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্টের এই ৩৪ বছরের রাজত্বে খুন হয়েছে ৫৪,১১৭ জন (বিধান সভায় প্রদত্ত তথ্য) যার মধ্যে অধিকাংশই সি.পি.আই.(এম) এবং সি.পি.আই.-এর আশ্রিত গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেসের ১০ বছরের (১৯৫২-১৯৬১) শাসনে পশ্চিমবঙ্গে খুনের সংখ্যা ছিল ২,৫০৩। ২০০১-২০১০ এই দশ বছরে নিরীহ মানুষের নিহতের সংখ্যা ১৬,৫৫৬ জন। গত বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন। "বিগত তিন বছরে প্রতি বছরই রাজ্যে খুন, রাজনৈতিক হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে"। এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ১লা জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে

খুন হয়েছে ২২৮৪ জন, ধর্ষণের সংখ্যা ২৫১৬ জন, শ্লীলতাহানি এবং বধূনির্যাতনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩০১৬ ও ১৭৫৭১ জন। সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত এই রাজ্যে ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতনের সংখ্যা ৭২৯৩৫ হিসাবে দেখানো হয়।

শিক্ষা

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার হাল শোচনীয়, সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য বর্তমান, রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে 'টিউশনি-রাজনীতি-দুনীর্তি' এই তিন সংগঠিত কার্যকলাপ 'গণতন্ত্রীকৃত' হয়ে অবাধে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। প্রাথমিক স্তরে এই রাজ্যে ড্রপ আউটের বিপুল সংখ্যা লজ্জাজনক। বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব শুধু খাতাপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সুদীর্ঘকাল পরে বামফ্রন্ট সরকারের বোধোদয় হয়েছে ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমের গুরুত্ব বুঝতে। শিক্ষান্তে পাশের হার বৃদ্ধির ঢক্কানিনাদ করে এই সরকার শিক্ষার মান্নোয়নের স্লোগান দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার গত ৩৪ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রগুলিকে বিপ্লবী রাজনীতির সূতিকাগার হিসাবে ব্যবহার করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণের সীমাহীন দুনীর্তির নজির রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সি.পি.আই.(এম)-এর জেলা সম্পাদকের আত্মীয় থেকে শুরু করে লোকাল সম্পাদক হোলটাইমার সকললেই কোন না কোন জেলায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে স্বীকার করে বলেছেন, "শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য দেখানো হয়েছে"। যেই প্রসঙ্গে প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ 'নিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ' এই মর্মে সাম্প্রতিককালে একটি রায় দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলার শিপ' নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সব রাজ্যের তপশীলি ও আদিবাসী গরীব মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল খরচ সহ সমস্ত খরচ দেওয়া হয়ে থাকে। ১৮৫ লক্ষ তপশীলি এবং ৪৪ লক্ষ আদিবাসী জনসংখ্যার পশ্চিমবঙ্গে এই খাতে খরচ ১২৩ লক্ষ

তপশিলী ও ৫০ লক্ষ আদিবাসী জনসংখ্যার অন্ধ্রপ্রদেশের চেয়ে কয়েকগুন কম। তপশীলি ও আদিবাসী খাতে অন্ধ্রের খরচ যথাক্রমে ২৩০ থেকে ২৪০ কোটি ও ১৬ থেকে ২২ কোটি টাকার মত। পশ্চিমবঙ্গে এই খরচ যথাক্রমে ৩০ থেকে ৩৫ কোটি ও ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯-এ অন্ধ্রের খরচ ২৩৯.৭৮ কোটি ও ১৬.৬২ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যয় করেছে ৩২.৫০ কোটি ও ৩.৯০ কোটি টাকা। ২০০৭ সালে অন্ধ্রের খরচ ২৪০.৪৮ কোটি ও ২২.৮৪ কোটি টাকা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খরচ হয়েছে ৩.৫৮ কোটি টাকা ও ৪৪ লক্ষ টাকা মাত্র। দেখা যাচ্ছে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দিচ্ছে অথচ এই রাজ্যে সেই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে না।

এই রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ হওয়ার পরে সব ছাত্র-ছাত্রী স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ পায় না। কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির পরিকাঠামো নেই। পরিকাঠামোহীন ব্যবসায়িক চিন্তাধারায় প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি গড়ে উঠেছে। পড়াশুনার পরিবেশ নেই স্নাতক কলেজগুলিতে এস.এফ.আই. ছাত্রদের গুন্ডাবাজীতে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত। উচ্চশিক্ষার স্বার্থে ভালো ছাত্রছাত্রী অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানপদে নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা শাসকদলের প্রতি তুলনাহীন আনুগত্য।

(৪)

পশ্চিমবঙ্গের আর্থ সামাজিক উন্নয়ণ ঃ কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য

আইন শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘ সময় যাবৎ মার্কসবাসীদের অপশাসনে গভীর সংকটাপন্ন। খুন-সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই রাজ্যে ভীতির পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। বিরোধীদের দমন করতে শাসকদল ও প্রশাসন হাতে হাত মিলিয়েছে। ক্ষমতায় থাকতে মাওবাদীদের ব্যবহার করার পর সি.পি.আই.(এম) এখন 'অতি বিপ্লবী'-দের বিরুদ্ধে অতি 'মুখর'। কংগ্রেস আগামী দিনে এই রাজ্যে

আইনের শাসনের পুনরুদ্ধার ও মানবাধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কংগ্রেস চায় দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিস প্রশাসন। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের দাবীতে কংগ্রেস সোচ্চার থাকবে। সাঁইবাড়ী, নেতাই, সূচপুর, ছোট আঙারিয়া, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের সি.পি.আই.(এম)-এর গণহত্যার বিচার করা হবে।

শিল্প

কংগ্রেস এই রাজ্যে শিল্পাবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সংস্থা এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সাথে আলোচনা করে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে। শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ বিষয়ে কংগ্রেস চায় একটি সুষ্ঠু ও সার্বিক জমি নীতি গ্রহণ করা হোক, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। অধিগৃহীত জমির উপর যে সব শিল্প বা ব্যবসা করা হবে তার লভ্যাংশের একটি অংশ যাতে হঠাৎ উৎখাত মানুষেরা পান সেই দাবীতে জোর দেবে কংগ্রেস, লক্ষ্য রাখবে ১৮৮৪ সালের অতি পুরনো আইনটি যাতে দ্রুত ও সার্বিকভাবে সংশোধিত হয়।

শ্রমিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে দেশী ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। রুগ্ন শিল্পগুলির সমস্যা সমাধানে এবং গ্রামীণ ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতির জন্য কংগ্রেস দৃষ্টি রাখবে। তন্তুবায়, মৎসজীবী, মৃৎশিল্প ও হস্তশিল্পীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নতির প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করা হবে।

পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে মজবুত করবার লক্ষ্যে কাজ করবে কংগ্রেস। সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এই রাজ্যে শিল্পপতিরা যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয় তা দূর করতে কংগ্রেস সচেষ্ট হবে। বেহাল রাস্তাঘাটগুলি দেখভাল করার জন্য মনিটরিং কমিটি গঠনের উপর জোর দেবে কংগ্রেস।

কর্মসংস্থান

যে সমস্ত কেন্দ্রীয় স্বনির্ভর কর্মসূচীগুলি বর্তমানে চালু, সেগুলিকে আরও কার্যকর করে তুলতে সচেষ্ট হবে কংগ্রেস। যে সমস্ত বেকার যুবক যুবতীদের

নিবন্ধীকরণ পাঁচ বছর অতিক্রম করেছে, তাদের জন্য একটি বিশেষ জীবিকা সংস্থানের কর্মসূচী রূপায়নে দৃষ্টি দেবে কংগ্রেস। কর্ম সংস্থানের কথা মাথায় রেখে যাতে সমস্ত সরকারী পরিকল্পনাগুলি প্রণয়ন হয় তা দেখা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মসংস্থান ও দারিদ্র মোচন পরিকল্পনাগুলিতে রাজ্যের অংশ গ্রহণ ও সাফল্য একশোভাগ নিশ্চিত করতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ণ

কংগ্রেস কৃষক ও খেত মজুরদের স্বার্থরক্ষায় সজাগ থাকবে। কেন্দ্রের ইউ.পি.এ. সরকারের গ্রামোন্নয়ণ যোজনা, কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্প এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীগুলিকে শতকরা একশভাগ গ্রামীণ বিকাশে প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রায় উত্তীর্ণ করতে জোর দেবে কংগ্রেস। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যগুলির বন্টনের জন্য মার্কেটিং ফেডারেশন গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা এবং ন্যূনতম মজুরী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ আমাদের মুখ্য বিবেচ্য কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হবে। বিদ্যুৎ ও সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি করে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার দিকে নজর রাখবে কংগ্রেস।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর ভাঙন ও গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যান

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে কংগ্রেস অগ্রাধিকার দেবে। নদীগুলির নাব্যতা বৃদ্ধিতে দৃষ্টি দেবে কংগ্রেস। নদীর ভাঙন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনায় হাত লাগাবে কংগ্রেস। গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যানকে গুরুত্ব সহকারে রূপায়িত করার জন্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে গ্রাম ও ব্লক স্তরে 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট'-গ্রুপ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব রাখবে কংগ্রেস।

পশ্চিমাঞ্চল স্বশাসিত উন্নয়ণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল জেলা সমূহের উন্নয়নের দিকে নজর দেবে কংগ্রেস। মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি সহ অনগ্রসর এলাকাগুলিতে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউ.পি.এ. সরকারের ঘোষিত 'ব্যাকওয়ার্ড রিজিওনস্ গ্রান্ট ফান্ড' যাতে দ্রুত চালু হয় তার জন্য কংগ্রেস দাবী রাখবে। এই এলাকার জনগণের দাবী পূরণে নির্বাচিত ও স্বশাসিত উন্নয়ণ পরিষদ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে কংগ্রেস।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু

কংগ্রেস রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়ণ বিষয়ে সক্রিয় হবে। দারিদ্র্যদূরীকরণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিতে সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে কংগ্রেস সক্রিয় ভূমিকা নেবে। সাচার কমিটি রিপোর্টের সুপারিশ মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কংগ্রেস সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত মান উন্নয়ণ, কর্মসংস্থান, উর্দুভাষার প্রসার, বৃত্তিপ্রদান, মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির মত উন্নয়ণকে কংগ্রেস এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর পঞ্চদশ শীর্ষক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা আগামীদিনে কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হবে।

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ অঞ্চলকে বিচ্ছিন্নতার ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর করাতে হবে একনিষ্ঠ কর্মপন্থার মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গের জন্য জাতীয় কংগ্রেস একটি স্ব-শাসিত উন্নয়ণ পর্ষদ গড়ে তুলবে এবং তাকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিয়ে স্বয়ংক্রিয় করে তুলবে। রবার, তামাক ও চায়ের চাষের আধুনিকীকরণ ও চা বাগান এলাকায় পঞ্চায়েতী সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়া হবে কংগ্রেসের অন্যতম কর্মসূচী।

নগর উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা

সুন্দর ও সুস্থ নাগরিক জীবনের পক্ষে কংগ্রেস। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেস চালু প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন উন্নয়ণ পরিকল্পনায় যুক্ত করা হবে। জওহরলাল নেহেরু ন্যাশন্যাল আরবান রিনিউয়াল মিশন প্রকল্প ও রাজীব গান্ধী আবাস যোজনার মাধ্যমে বস্তিবাসী ও গরিব মানুষের উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি যাতে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হয় সে দিকে জাতীয় কংগ্রেস নজর দেবে।

পরিবেশ উন্নয়ন এবং দূষণরোধ

উন্নয়নের দাবীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কংগ্রেস পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে মনোযোগী হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ ধ্বংস রুখতে কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের নীতি নির্দেশগুলি মেনে চলবে ও যথোচিত আইন প্রণয়নে তৎপর হবে।

শিক্ষা

চলতি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে কংগ্রেস প্রযত্নশীল। আধুনিক ও কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক। এছাড়া বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরের ভাষা পাঠ্যক্রমগুলিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী আর্থিক উদ্যোগ ও সাহায্য গ্রহণ করলেও কংগ্রেস সতর্ক থাকবে যাতে দরিদ্র ছাত্রদের স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। বৃত্তির সুযোগও বৃদ্ধি করার সাথে সাথে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করার ব্যাপারেও উদ্যোগী হবে কংগ্রেস।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে। কঠোরভাবে নিয়মাবলী শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সক্রিয় পদক্ষেপ নেবে। আধুনিক এবং প্রযুক্তি সংযুক্ত হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে যাতে সবরকমের রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা মজুত থাকে। কংগ্রেস স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কালোবাজারির বিরুদ্ধে। বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে কংগ্রেস সচেষ্ট হবে। আর্সেনিক দূষণ রোধেও কংগ্রেস কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সামাজিক কল্যাণ

শারীরিক বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে কংগ্রেস বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গড়ে তুলবে। মানসিক বিকলাঙ্গদের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বৃদ্ধ ও পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। অনাথ ও পথ শিশুদের সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালানো হবে। যৌন কর্মীদের সন্তান-সন্ততিদের পড়াশোনা ও সুস্থ পরিবেশে বেড়ে

ওঠার জন্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই বিষয়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাহায্যও গ্রহণ করা হবে।

নারী অধিকার

আজকের আধুনিক বিশ্বে নারীর প্রাপ্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। কংগ্রেস নারী বিষয়ক বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পকে রূপায়িত করার বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক আইনগুলিও কংগ্রেস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে পালন করবে। নারী নির্যাতন রোধ বিষয়ে কংগ্রেস আরও সক্রিয় হবে। চাকরিজীবী মহিলা ও ছাত্রীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শিল্প-সংস্কৃতি

জাতীয় কংগ্রেস শিল্প সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে। এক সুস্থ ও উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলে সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। উন্নয়নের ওপর জোর দেবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রসায়নাগার এবং পরীক্ষাগারগুলির ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মান উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হবে। রাজ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রসারের মানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাবে।

উদ্বাস্তু সমস্যা

রাজ্য গঠনে কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের অবদান স্বীকার করে। তাঁদের অনিষ্পন্ন সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম ও তাদের অবদান লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি প্রকল্প চালু করবে। ২০০৪ সালে Citizenship Act-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের দাবীর মাধ্যমে ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে পূর্বে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

তপসিলী জাতি ও উপজাতি

তপসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত সব সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে সেগুলিকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হবে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সরকারী প্রকল্পে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির সুযোগও বাড়ানো হবে।

হিন্দি ভাষাভাষীদের স্বার্থ সুরক্ষা

রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় এ যাবৎ কোনও সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দি ভাষা ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র আজও হিন্দিতে করা হয়নি। কংগ্রেস হিন্দি একাডেমি ও প্রশ্নপত্র হিন্দিতে প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেস সচেষ্ট হবে। ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চল ও শিল্প অধ্যুষিত এলাকায় আরও বেশি হিন্দি বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য কংগ্রেস দাবী জানাবে। এর পাশাপাশি গোটা রাজ্যে হিন্দি কলেজ স্থাপনের ব্যাপারেও উদ্যোগী হবে।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (এন.জি.ও.)

বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে এন. জি. ও.গুলির ওপর খড়্গহস্ত হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এঁদের লক্ষ্য এন.জি.ও.-দের করায়ত্ত করে তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী পার্টির কর্মসূচী হিসাবে চালানো। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, নারী ও শিশু কল্যাণ, স্বনির্ভর কর্মসূচী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার এন.জি.ও.-দের সাথে এক যোগে কাজ করবে ও আর্থিক ও প্রশাসনিক সাহায্য প্রদান করবে।

পর্যটন

সরকার পর্যটন বিভাগকে সক্রিয় করার চেষ্টা করবে। উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন এবং উপজাতি নিবাসী এলাকাগুলিতে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং বর্তমানে যে সব পর্যটন কেন্দ্রগুলি রয়েছে সেগুলির উন্নয়ন বিষয়েও সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পার্বত্য অঞ্চল

কংগ্রেস পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করবে। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাগুলির নিরসনে কংগ্রেস প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। নেপালী ভাষার প্রচার ও প্রসারের বিষয়ে কংগ্রেস ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। পাহাড়ে স্বায়ত্বশাসনের জন্য বর্তমানে যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা চলছে তার স্বত্বর ও দ্রুত সম্পাদনার মধ্য দিয়ে পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য। কোনো অবস্থাতেই কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন মানবে না।

তরাই ও ডুয়ার্স

পশ্চিমবঙ্গে তরাই ও ডুয়ার্সে নাগরিকদের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য জাতীয় কংগ্রেস প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আলোচনার মাধ্যমে ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যুক্তিসংগত ন্যায্য দাবী বিবেচনা করবে।

বিভিন্ন মামলা / দাবী

কংগ্রেস মনে করে বহুদিন ধরে অনিষ্পন্ন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যাতে মামলাগুলি ঝুলে না থেকে দ্রুত শেষ হয় সেটিই হবে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

সুন্দরবন উন্নয়ণ

পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে পরিবেশের ভারসাম্যতার অভাবের ফলে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। এই অঞ্চলে লবণাক্ত জলের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে এবং নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদনের জন্য এ অঞ্চল ধ্বংস হতে চলেছে। তাকে বাঁচাতে চাই দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যানের দ্রুত বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় এবং কলেজ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। মৎস্য চাষীদের মাছ ধরার ট্রলার কেনার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কংগ্রেস চোরাশিকার বন্ধে ব্যবস্থা নেবে।

(৫)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ঘোষণা

- পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, হিংসা-প্রতিহিংসা রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কার্যকরী পদক্ষেপ; সমস্ত স্তরে প্রশাসনিক সংস্কার; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পুলিশি ব্যবস্থা ও স্বচ্ছ প্রশাসন।
- কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণে নতুন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্ব; সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণকরণ।
- ১৮৯৪ সালে জমি অধিগ্রহণ আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনের আলোকে পশ্চিমবঙ্গে জমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সার্বিক মূল্যায়ণ; শিল্পের ও জনহিতকর প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও পারদর্শিতা; জমিদাতাদের জন্য বাজার মূল্যে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ।
- প্রস্তাবিত খাদ্য নিরাপত্তা আইনে অন্তর্গত সমস্ত সুযোগ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া এবং রেশন ব্যবস্থাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসু করে তোলবার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
- পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ; প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের যোগান; প্রতিটি গ্রামে ও বাড়িতে বিদ্যুত সরবরাহ।
- কেন্দ্রীয় সরকারের দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ও অন্যান্য সমস্ত জনমুখী ও কল্যাণকর প্রকল্পগুলির ১০০ ভাগ দ্রুত ও কার্যকর রূপায়ণ।
- শিল্পায়নে জোয়ার আনতে দেশী ও বিদেশী পুঁজি, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তির সুপরিকল্পিত সদ্ব্যবহার।
- মানবসম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও উৎকর্ষতাকে অগ্রাধিকারের প্রয়োজনে Technology Mission ও Knowledge Mission।
- সর্বস্তরে কারিগরী শিক্ষার প্রসার, গুনমান বৃদ্ধি ও পরিকল্পিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রোজগার বৃদ্ধি ও কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

- পাঁচ বছর বা তার বেশী সময় ধরে নিবন্ধিভুক্ত সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রকল্প।
- অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে কমিশন গঠন।
- ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা।
- উত্তরবঙ্গে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ এবং উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।
- শিল্পায়ণ, উন্নত পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্রের রূপদান ও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘোষিত কর্মসূচী নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ডাঃ মানস রঞ্জন ভূঞ্যা

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি

পরিবর্তনের পক্ষে উন্নয়নের লক্ষ্যে

কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করুন।